উদ্বোধন
১২৩

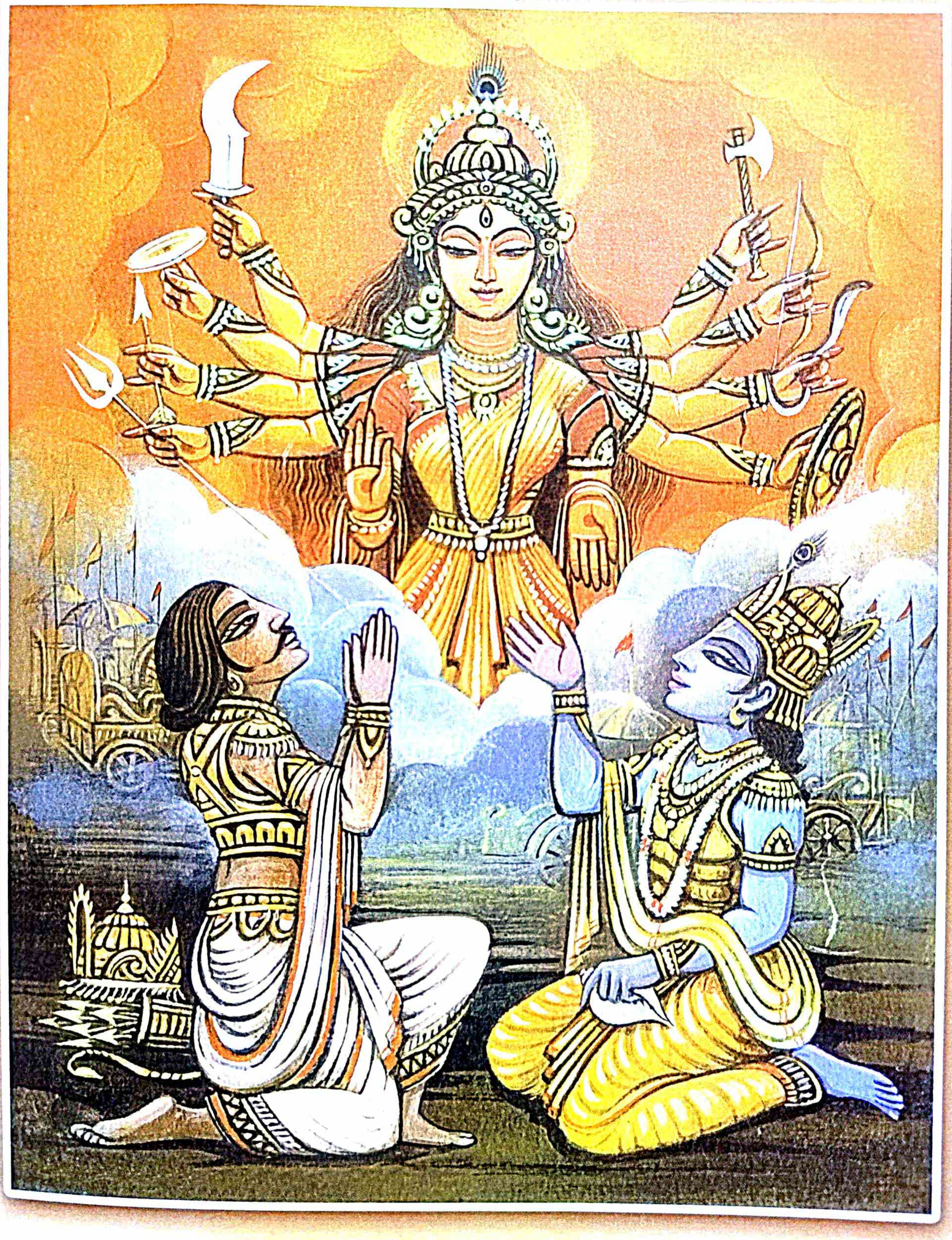

শারদীয়া · আশ্বিন ১৪২৮ · ৯ম সংখ্যা · ১২৩তম বর্ষ · উদ্বোধন কার্যালয় · কলকাতা

১২৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

উদ্বোধন ।।১২৩।।

আশ্বিন ১৪২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

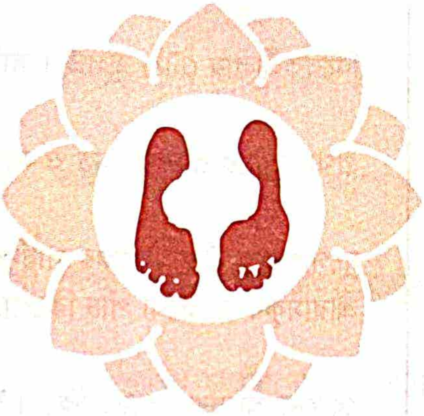

দিব্যবাণী

শ্রীমা সারদাদেবী ॥ ৬১৫

কথাপ্রসঙ্গে

'প্রতি-মা'য় মাকে দেখ ॥ ৬১৬

বাণী তব ধায়

সাধনা বা উচ্চতর জীবনের প্রস্তুতি । স্বামী বিবেকানন্দ ॥ ৬১৯

ভাবসুধা

সাধনজীবনে ব্যাকুলতা । স্বামী ভূতেশানন্দ ॥ ৬২২

রামকৃষ্ণ সংঘের আদর্শ—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' । স্বামী স্মরণানন্দ ॥ ৬২৬

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

আজ আগমনির আবাহনে । স্বামী অলোকানন্দ ॥ ৬২৯

মহিষাসুরমর্দিনীর বিদেশযাত্রা : আরাধ্যা দেবীর 'মিউজিয়াম অবজেক্ট' হয়ে ওঠার কাহিনি । অঙ্কন পুরকাইত ॥ ৬৩২

দুর্গাপূজা: কিছু তত্ত্ব ও তথ্য । স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ ॥ ৬৩৯

একটি দুর্গাপূজার ঘটনা । জ্যোতির্ময়ী দেবী ॥ ৬৫২

দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ ৬৫৪

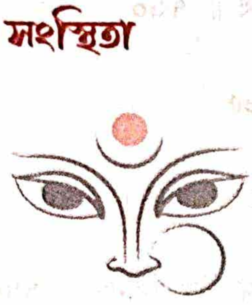

সম্পাদক: স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ

ব্যবস্থাপক সম্পাদক: স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র : গোপাল চন্দ্র নস্কর প্রচ্ছদ রূপায়ণ : শুভ্রকান্তি দে অলংকরণ : দিলীপ কুমার পাত্র, রিজুস মাইতি, তরুণ সামন্ত

মহিষাসুরমর্দিনীর বিদেশযাত্রা: আরাধ্যা দেবীর 'মিউজিয়াম অবজেক্ট' হয়ে ওঠার কাহিনি

অঙ্কন পুরকাইত
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়, কাপগারি, ঝাড়গ্রাম

বহু প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশে বা ভারতের পূর্বপ্রান্তে শক্তিপূজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে আদি-মধ্য যুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদের প্রভাবে শাক্ত উপাসনার প্রসার ঘটে। শাক্ত দেবীদের মধ্যে দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপটি বহুপূজিত। সময়ের সাথে সাথে এই জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে বহু বৈদেশিক পর্যটকের লেখায় দুর্গাপুজো এবং তাকে ঘিরে বিপুল আয়োজনের উল্লেখ আমরা বারংবার দেখতে পাই। অনেক সময়ে তাঁরা কৌতূহলবশত দুর্গার মূর্তি, পট ও ছাপাই করা ছবি সংগ্রহও করতেন এবং বিদেশে নিয়ে যেতেন। মহিষাসুরমর্দিনীর যে বিদেশযাত্রা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক কালে, তার ধারা উত্তর-ঔপনিবেশিক কালেও অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান এই অতিমারীর পরিস্থিতিতে বিদেশের বহু সংগ্রহশালা তাদের সংগ্রহে থাকা 'অবজেক্ট'গুলিকে আন্তর্জালের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরকমই একটি প্রয়াসের ফলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহে থাকা ভারতবর্ষের কিছু প্রাচীন মূর্তি দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি বিশেষ নজর কাড়ে। বস্তুসামগ্রীর মতো এই মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিটিও একটি মিউজিয়াম 'অবজেক্ট' হিসাবেই দেখানো হয়েছে সেখানে। মূর্তিটির নান্দনিক গুরুত্বে ভিড় জমান উৎসাহী দর্শক বা গবেষকরা; কিন্তু কোনো ভক্ত তার আরাধ্যকে দর্শন করতে সেখানে যায় না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কীভাবে একজন হিন্দুদেবী বা ভক্তের আরাধ্য-বিগ্রহ বিদেশের একটি মিউজিয়াম 'অবজেক্ট'-এ রূপান্তরিত হলেন? এখানে সেই যাত্রাপথের ইতিহাসকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বঙ্গদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ের ইতিহাসচর্চায় মোটের ওপর ইংরেজ রাজশক্তির হাতে ভারতীয়দের পরাজয়, প্রাচ্য-সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বহুচর্চিত এই ইতিহাসের উলটো একটি দিক আছে, যা বিদেশিদের মরমি মনের পরিচয় দেয়। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি যে সর্বত্রই তাদের বিজয়রথকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারত, তা কিন্তু নয়। দেশীয় রাজা বা অপরাপর শক্তির কাছে তাদের পরাজয়স্বীকারও করতে হয়েছে। সৈন্যদের মনোবলকে ধরে রাখার জন্য তারা অনেক সময়েই ভারতীয় দেবদেবীদের মাহাত্ম্যকীর্তন করত কিংবা নতমস্তকে প্রার্থনা করে বিজয়যাত্রায় অগ্রসর হতো। এমনকি কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ইংরেজরা কালী বা দুর্গা-মন্দিরে পূজা দিত।[১] এরকমই একজন ব্যক্তি ছিলেন জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট।

স্টুয়ার্টের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাস এতটাই ছিল যে, তিনি গঙ্গাস্নান, পূজা-জপ, প্রসাদধারণ ইত্যাদি নিয়মিত নিষ্ঠাসহ করতেন।[২] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Vindication Of The Hindoos*-এ তিনি জানিয়েছেন, খ্রিস্টান পাদরিদের দ্বারা হিন্দুদের যে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে তা আদতে নিষ্প্রয়োজন এবং তার কোনো যৌক্তিকতাই নেই। খুব স্বাভাবিক কারণে তিনি 'হিন্দু স্টুয়ার্ট' নামেই বেশি পরিচিতিলাভ করেছিলেন। তবে কীভাবে স্টুয়ার্টের হাত ধরে অবিভক্ত বাংলার দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি কালাপানি পার করে বিদেশে পাড়ি দিল তা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে গবেষণার এক নতুন দিক নির্দেশ করে।

স্টুয়ার্ট তাঁর সুদীর্ঘ সৈনিকজীবনে ভারতবর্ষের বহু প্রান্তে স্থানান্তরিত হন; বিশেষ করে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার আনাচে-কানাচে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই সময়কালেই তিনি বহু দেবদেবীর মূর্তি সংগ্রহ করতে থাকেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, স্টুয়ার্টের সমসাময়িক কালে পাথরে তৈরি মূর্তি সংগ্রাহকদের দৃষ্টি সেভাবে আকর্ষণ করেনি। কারণ, এগুলি ভারী হতো; বিদেশে নিয়ে যাওয়াও ছিল বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। তবে কীভাবে স্টুয়ার্ট এই মূর্তিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন? এই বিষয়ে অবশ্য পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে, তিনি নিজে এইসব মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন। তবে তিনি নিজে সংগ্রহ করলেও তাঁর বিশেষ কিছু লোক ছিল, যারা তাঁকে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখত। আবার একদল পণ্ডিতের মতে, তিনি মূর্তিগুলি চুরি করে আনতেন। তবে দ্বিতীয় মতটি কখনোই সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না। যেমন Jorge Fisch বলেছেন, স্টুয়ার্ট যে মূর্তি চুরি করতেন—এমনটি বলার কোনো কারণ নেই।[৩] তাঁর

হিন্দুধর্মের প্রতি একধরনের প্রশ্নাতীত আনুগত্য ছিল, তাই তিনি এই মূর্তিগুলি সংগ্রহ করতেন। এগুলি কখনোই তাঁর চৌর্যবৃত্তির পরিচায়ক ছিল না।

স্টুয়ার্ট তাঁর নিজের সংগ্রহ করা বেশির ভাগ মূর্তিই রাখতেন চৌরঙ্গির উড স্ট্রিটের নিজস্ব বাসভবনে। তাঁর সংগ্রহে থাকা বস্তুগুলির কোনো 'রেকর্ড বুক' বা 'ক্যাটালগ' জাতীয় কিছু পাওয়া যায়নি। হয়তো তাঁর ইচ্ছা ছিল—তিনি নিজে এই পুরো সংগ্রহটিকে লন্ডনে নিয়ে যাবেন, কিন্তু বাস্তবে তা আর সম্ভবপর হয়নি। ১৮২৮ সালে তাঁর মৃত্যু হলে সমস্ত মূর্তি ও অন্যান্য সামগ্রী ১৪৩টি বাক্সে বন্দি করে লন্ডনে পাঠানো হয়। জাহাজে করে নিয়ে যেতে এই মূর্তিগুলির 'ইনসিওরেন্স'-মূল্য তৎকালীন ভারতীয় বাজারে পড়েছিল প্রায় ৩,০০০ টাকা। লন্ডনে যাওয়ার পর এই মূর্তিগুলিকে ১৮৩০ সালের ১১ থেকে ১৫ জুনের মধ্যে ভাগ ভাগ করে নিলামে তোলা হয় (Christie's Auction)। দুঃখের বিষয়, তখন ইউরোপের বাজারে এই মূর্তিগুলিকে দাম দেওয়ার মতো কেউ ছিল না অথবা মূর্তিগুলির নান্দনিক ও শৈল্পিক উৎকর্ষ সমসাময়িক পাশ্চাত্যের মানুষকে সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। পরে স্টুয়ার্টের সংগ্রহের বেশির ভাগ সামগ্রীই জন ব্রিজ নামে এক ব্যক্তি কিনেছিলেন। ব্রিজের মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরসূরিরা এই মূর্তিগুলিকে নিলামে না তুলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করে, যা আজ 'ব্রিজ কালেকশন' নামে বেশি পরিচিত।[৪]

এখানে প্রথম ছবিটিতে ব্রিজ কালেকশনে বেলেপাথরের যে-মূর্তিটি আমরা দেখাতে পাচ্ছি, সেটি উড়িষ্যা থেকে সংগ্রহ করা

চিত্র ১ : মহিষাসুরমর্দিনী, আনুমানিক ৮ম শতাব্দী, উড়িষ্যা, বেলেপাথর, দৈর্ঘ্য-৪৪.৫০ সেমি., প্রস্থ-৩৩.৫০ সেমি., বেধ-১১.৮০ সেমি., ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংখ্যা ১৮৭২,০৭০১.৮৯

এবং আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত। মূর্তিটি আটবাহুবিশিষ্ট ও আলীঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান; কারণ, দেবীর ডান পা উত্থিত ভঙ্গিতে মহিষাসুরের বুকের কাছে রয়েছে। শিল্পী এই মূর্তিটিতে ত্রিমাত্রিকতার প্রভাব দেওয়ার চেষ্টা করলেও দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবই বেশি পরিস্ফুট হয়। ডানদিকের ওপরের হাতে রয়েছে খড়্গ, তার পরের হাতে ত্রিশূল—যা দিয়ে দেবী মহিষাসুরের গলদেশ ভেদ করেছেন। তার পরের হাতগুলিতে যথাক্রমে বাণ ও শক্তি রয়েছে। বামদিকের ওপরের হাতে দেবীর প্রতিরক্ষার জন্য রয়েছে ঢাল, তার পরের হাত দিয়ে দেবী মহিষের মাথাটিকে উলটোদিকে চেপে ধরেছেন। পরের হাতগুলিতে যথাক্রমে ধনুক ও নাগপাশ রয়েছে। দেবীর শিরোদেশে জটা, উন্নত বক্ষস্থল, ক্ষীণ কটিদেশ—এসবই তাঁর দৈহিক সুষমাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই মূর্তিটির মধ্যে সামগ্রিকভাবে শুভাশুভের যে সংঘাত তা খুবই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত; কিন্তু দেবীর মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত নৈর্ব্যক্তিক প্রশান্তি বিরাজমান। তাঁর স্মিতহাসিটুকু যেন জগতের কোনো কিছুকেই স্পর্শ করে না!

দ্বিতীয় ছবিটিতে যে-মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও ভারতের পূর্বপ্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা এবং

চিত্র ২ : মহিষাসুরমর্দিনী, ৯ম থেকে ১০ম শতাব্দী, পূর্ব ভারত, ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংখ্যা ১৮৭২,০৭০১.৭৯

এর নির্মাণকাল নবম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের তৈরি, আটবাহু-বিশিষ্ট, পৃষ্ঠপটযুক্ত ফলকের ওপর উৎকীর্ণ এবং ফলকের ওপরের ভাগটি অর্ধগোলাকৃতিরূপে দেখতে পাই। শরীরের গঠনভঙ্গি সুডৌল হলেও বহিঁরেখা

এতটাই দৃঢ় যে, তা অনেক সময়েই দেহভঙ্গিকে আড়ষ্ট করে তুলেছে। এখানে দেবী প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান; বাম পা উত্থিত ভঙ্গিতে ভূলুণ্ঠিত মহিষের ওপর রাখা। দেবীর অস্ত্র এবং হাতের বিন্যাস অনেকটাই আগের মূর্তিটির মতো।

তৃতীয় ছবিটিতে যে-মূর্তিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটি উড়িষ্যার কোনারক অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা। এই মূর্তিটির

চিত্র ৩ : মহিষাসুরমর্দিনী, ১৩শ শতাব্দী, কোনারক, দৈর্ঘ্য-১০৬.৮০ সেমি., প্রস্থ-৪৮.৩০ সেমি., বেধ-২৯.২০ সেমি., ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংখ্যা ১৮৭২,০৭০১.৭৮

নির্মাণকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। এখানে মূর্তিটিকে তার পৃষ্ঠপট থেকে উন্মুক্ত করার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এখানেও দেবী আলীঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। দেবীর শিরোদেশে জটামুকুট, হাতে বাজুবন্ধ ও কঙ্কন। উন্নত বক্ষস্থল নানারকমের রত্নহার দ্বারা সুসজ্জিত। মূর্তিটির এই আলংকারিক আতিশয্যের ফলে তাঁর বীর ও পরাক্রমী ভাবটি কোথাও যেন হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয়। মহিষাসুর যেন দেবীর পদতলে অনায়াসে ধরা দিয়েছে! ফলত মহিষকে দমন করতে দেবীকেও যেন আর আলাদাভাবে শক্তিপ্রয়োগ করতে হয়নি।

স্টুয়ার্টের সংগৃহীত এসকল মূর্তি সমকালীন ইতিহাসে ধর্মীয় সাধনার ধারাটি তুলে ধরে। আদি-মধ্য যুগ থেকে উড়িষ্যায় শক্তিপূজার, বিশেষ করে মহিষাসুরমর্দিনীর পূজার সূচনা হয়। আটবাহুবিশিষ্ট মহিষাসুরমর্দিনী পূজার বেশি প্রচলন ঘটে ভৌমকারদের রাজত্বকালে (৭৩৬—৯৪৮ সাল)। তাঁরা ছিলেন মূলত তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদের পৃষ্ঠপোষক।

স্টুয়ার্টের সমসাময়িক কালে এমন কিছু বিদেশি ছিলেন, যাঁরা এই মূর্তিগুলিকে কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবেই সংগ্রহ করতেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে জানার জন্য। এঁদের মধ্যে কানিংহ্যাম সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বড়লাট লর্ড ক্যানিং আলেকজান্ডার কানিংহ্যামকে ভারতের প্রথম আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার হিসাবে নিযুক্ত করেন। কানিংহ্যাম গয়া, বৌদ্ধগয়া, রাজগিরের মতো বহু জায়গায় খননকার্য চালিয়ে বেশ কিছু দুর্গামূর্তি সংগ্রহ করেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং নেপাল অঞ্চলে যে আদি-মধ্য যুগ থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদের প্রভাব ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। নানারকমের মূর্তির উল্লেখ কানিংহ্যামের আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্টে একাধিকবার পাওয়া যায়। এই পর্বে তিনি যে-মূর্তিগুলি সংগ্রহ করেন সেগুলির বেশির ভাগই ১৮৮৭ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করে দেন। সেরকমই একটি পোড়ামাটির তৈরি দুর্গামূর্তির ছবি (চিত্র ৪) এখানে দেওয়া

চিত্র ৪ : দুর্গা, ৯ম শতাব্দী, গয়া, পোড়ামাটি, দৈর্ঘ্য-২৯ সেমি., প্রস্থ-২২.৫০ সেমি., বেধ-৭.৪০ সেমি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংখ্যা ১৮৮৭,০৭১৭.৬৮

হলো। এটি প্রায় নবম শতাব্দীতে নির্মিত এবং এর প্রাপ্তিস্থান হলো গয়া।

ভারতবর্ষ থেকে এই সময়কালে শুধু যে প্রাচীন মহিষাসুরমর্দিনী বা দুর্গার মূর্তি বিদেশে গিয়েছিল তা নয়, এমন

কিছু দুর্গামূর্তি ভারত থেকে বিদেশে যায়, যেগুলি বিদেশযাত্রার জন্যই তৈরি করানো হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সুদক্ষ কারিগর তুলসীরামের তৈরি হাতির দাঁতের সপরিবার দুর্গামূর্তি। পঞ্চম ছবিতে যে-মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি বাংলার তৎকালীন নবাব দ্বিতীয় মুবারক আলি খান ১৮৩৮-এ ইংল্যান্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। তুলসীরামের তৈরি এই সপরিবার দুর্গামূর্তিটির বিন্যাস অনেকটাই আজকের

চিত্র ৫ : মহিষাসুরমর্দিনী, হাতির দাঁতের, শিল্পী : তুলসীরাম, মুর্শিদাবাদ, ১৮৩৬, উইন্ডসর ক্যাসেল, লন্ডন, বর্তমানে ব্যক্তিগত সংগ্রহে

একচালা দুর্গামূর্তিগুলির মতো। এর পৃষ্ঠপট জুড়ে পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব খুব স্পষ্ট; দেবীর মুখমণ্ডল ও মুকুটে মহারানি ভিক্টোরিয়ার মুখাবয়বের প্রভাব কিছুটা রয়েছে বলে মনে হয়। তবে বেশি ভাবিয়ে তোলে, একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীকে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করতে তৎকালীন যুগেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি!

ষষ্ঠ ছবিটিতে আমরা যে-মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছি সেটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে রয়েছে। এই মূর্তিটি সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করা। পাথরের তৈরি এই মূর্তিটি অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত। এখানে দেবীকে তাঁর পৃষ্ঠপট থেকে মুক্ত করার একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এখানে দেবী আটবাহুবিশিষ্ট ও আলীঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। দেবীর ত্রিশূল মহিষের পৃষ্ঠ ভেদ করে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মহিষাসুরকে দেবী মহিষের গলা থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করেছেন। এই দৃশ্য দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত 'ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া' শব্দগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে

চিত্র ৬ : মহিষাসুরমর্দিনী, ৮ম শতাব্দী, উত্তরপ্রদেশ, বেলেপাথর, ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

দেবী, মহিষাসুর ও মহিষ ছাড়া আরো দুজনকে দেখা যাচ্ছে। এঁরা সম্ভবত কোনো পার্শ্বদেবতা বা ভক্ত হবেন। এই মূর্তিটি ১৯৯৮ সালে ঐ মিউজিয়ামের সংগ্রহে স্থান পায়। এটি প্রখ্যাত শিল্প-ঐতিহাসিক স্টেলা ক্রামরিশ নামাঙ্কিত তহবিলের সাহায্যে কেনা হয়।

চিত্র ৭ : দুর্গা, ৮ম শতাব্দী, উড়িষ্যা, বেলেপাথর, ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সপ্তম ছবির মূর্তিটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে রয়েছে। এই মূর্তিটির সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত প্রথম ছবিটি অর্থাৎ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যে-মূর্তিটি রয়েছে তার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দেবীর দেহভঙ্গি ও হাতের বিন্যাস প্রায় একইরকম। অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত এই

মূর্তিটি উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা। মূর্তিটি ১৯৫৬ সালে ঐ মিউজিয়ামে স্থান পায়।

এর পরের মূর্তিটি (চিত্র ৮) নেদারল্যান্ডসের রিজিক্স মিউজিয়ামে রয়েছে। এই মূর্তিটির শৈলীগত বৈশিষ্ট্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এটি বাংলার পাল-সেন যুগে নির্মিত। দশবাহুবিশিষ্ট এই দেবীমূর্তিটি বর্তমান বাংলাদেশের কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করা।

চিত্র ৮ : দুর্গা, ১০০০-১১০০ শতাব্দী, বাংলাদেশ, রিজিক্স মিউজিয়াম, নেদারল্যান্ডস

নবম ছবিতে আমরা যে-মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম অব আর্ট-এ রয়েছে। এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করা। এটির নির্মাণকাল নবম-দশম শতাব্দীর মধ্যে হবে। এখানে মহিষ ও মহিষাসুরের অবস্থানটি একটু অন্যরকম। এখানে মহিষাসুরের মাথা ও ধড়কে পুরোপুরি আলাদা না করে মহিষের ঘাড়ের কাছে করা একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে মহিষাসুরকে টেনে বের করার চেষ্টা হয়েছে।

চিত্র ৯ : দুর্গা, ৯ম শতাব্দী, উত্তর-পূর্ব ভারত, ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম অফ আর্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পাথরের মূর্তির চেয়ে পট বা ছবি বিদেশে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতা নগরীর উপকণ্ঠে কালীঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে পটুয়াপাড়া গড়ে ওঠে তা সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বৈদেশিক পর্যটকরা যে এগুলি সংগ্রহ করত তা ফানি পার্কসের মতো অনেকের লেখা থেকে জানা যায়।

দশম ছবিতে যে-পটটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি এখন লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রয়েছে। এই পটটি

চিত্র ১০ : দুর্গা, কালীঘাট পটচিত্র, ১৯শ শতাব্দী, কলকাতা, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম

কালীঘাট অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা এবং ১৮৯০ সালে এটি ঐ মিউজিয়ামের সংগ্রহে স্থান পায়। এর পরের পটটিও (চিত্র ১১) কালীঘাটের এবং বর্তমানে Chester and Davida Herwitz নামে

চিত্র ১১ : দুর্গা, কালীঘাট পটচিত্র, ১৯শ শতাব্দী, কলকাতা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ

ব্যক্তিদ্বয়ের সংগ্রহে রয়েছে। কালীঘাটের পট সাধারণত চৌকো পটই হতো। অন্যদিকে গ্রামবাংলার পটগুলি বেশির ভাগই জড়ানো পট হতো। পরের ছবিটির বাঁদিকে (চিত্র ১২) সেরকমই

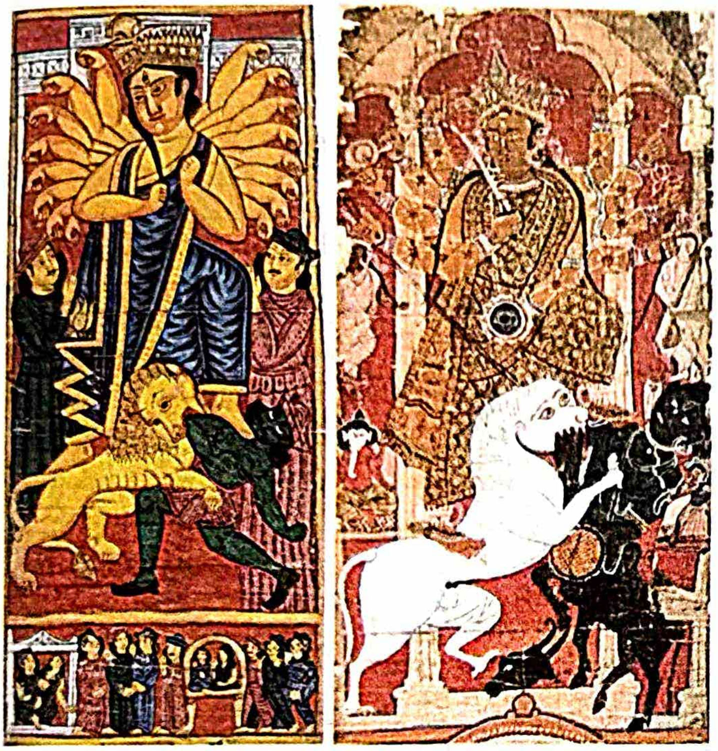

চিত্র ১২ : দুর্গাপট, ১৯শ শতাব্দী, বাংলা, ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

একটি জড়ানো পটের অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছি। এটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে রয়েছে এবং এটিকে Isabel G. Wellisz ১৯৬৯ সালে ঐ মিউজিয়ামে দান করেন। এটি সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মেদিনীপুরের কোনো অঞ্চলে আঁকা হয়। দ্বাদশ ছবিটিতে ডানদিকে যে-পট আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটিও একটি জড়ানো পটের অংশবিশেষ। এখানে দশবাহুবিশিষ্ট সপরিবার দুর্গাকে দেখতে পাচ্ছি; এটি ১৯৯৪ সালে ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে স্থান পায়। বাংলার পটের ইতিহাসে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ফৌজদারদের আঁকা দুর্গাপট খুবই বিখ্যাত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহে থাকা যে-পটটি (চিত্র ১৩) দেখতে পাচ্ছি, সেটি সুধীর ফৌজদার নামে এক শিল্পীর আঁকা। এটি প্রায় ১৯৮৯ নাগাদ সংগ্রহ করা হয়। এটি বিষ্ণুপুরের পট হলেও মল্লরাজবাড়ির পট নয়; কারণ, মল্লদের পটে দেবীর মুখের কেবল একপাশই দেখা যায়। সম্ভবত এটি কুচিয়াকোল রাজবাড়ির পট, যেটি বিষ্ণুপুর শহরের কাছেই অবস্থিত।

সময়ের সাথে সাথে দেবতাদের ছবির চাহিদা বাড়তে থাকে। পটুয়ারা কিন্তু এই বাড়তে থাকা চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারেনি। টানাপোড়েনের মধ্যে কলকাতার বাজারে কাঠখোদাই চিত্র বা woodcut print প্রসারলাভ করে। এই শিল্পীরা মূলত থাকত উত্তর কলকাতার শোভাবাজার, বটতলা, কম্বুলিটোলা ও আহিরীটোলা অঞ্চলে। প্রথমত, এই ছবিগুলো তৈরি করার খরচ ছিল খুবই কম এবং একসঙ্গে অনেকগুলি তৈরিও করা যেত। এখানে দুর্গার যে কাঠখোদাই চিত্রটি (চিত্র ১৪) দেখতে পাচ্ছি, সেটি কৃষ্ণচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি ১৮৬০ সালে তৈরি করেন। ছবিটি ১৯০৪ সালে ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে স্থান পায়। এই woodcut print-ও তার বাজার বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। ১৮৭০-এর দশক থেকে যখন ছাপাই করা রঙিন ছবি (লিথোগ্রাফ) বাজারে আসতে থাকে,

চিত্র ১৩ : দুর্গাপট, বিষ্ণুপুর, ২০শ শতাব্দী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন

তখন স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। পঞ্চদশতম চিত্রে যে-লিথোগ্রাফটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি বর্তমানে ইংল্যান্ডের ওয়েলকাম কালেকশনে রয়েছে। দশভুজা দুর্গার এই ছবিটি মুদ্রিত হয় ক্যালকাটা আর্টস স্টুডিওতে। এর পরের লিথোগ্রাফটি (চিত্র ১৬) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে; ১৮৯৫ সালে বাংলা আর্টস স্টুডিওতে এটি ছাপা হয়েছিল।

দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে এইসব অনবদ্য শিল্পকীর্তির বিদেশযাত্রার কারণ বা প্রেক্ষিত যতই ভিন্ন হোক না কেন, এরা সবাই যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ভারতীয় শিল্পভাণ্ডারের প্রতীক হিসাবে বিদেশের বিভিন্ন যাদুঘরে আজ শোভা পাচ্ছে। এই অতিমারীর কালেও দেশীয় শিল্পকে তুলে ধরার যে নিরন্তর প্রয়াস চলছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতেই হয়—"যুগের পর যুগ ধরে আকাশ

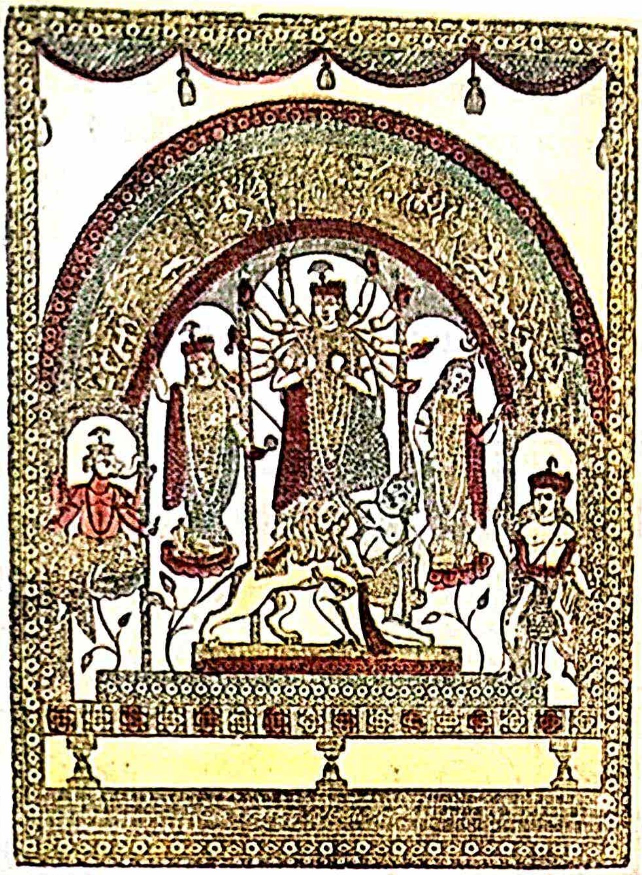

চিত্র ১৪ : দুর্গা, ১৮৬০, woodcut print, কলকাতা, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন

ঘনঘটার আয়োজন করেই চললো—কবে মেঘের কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লন্ডন শহরের উপরে

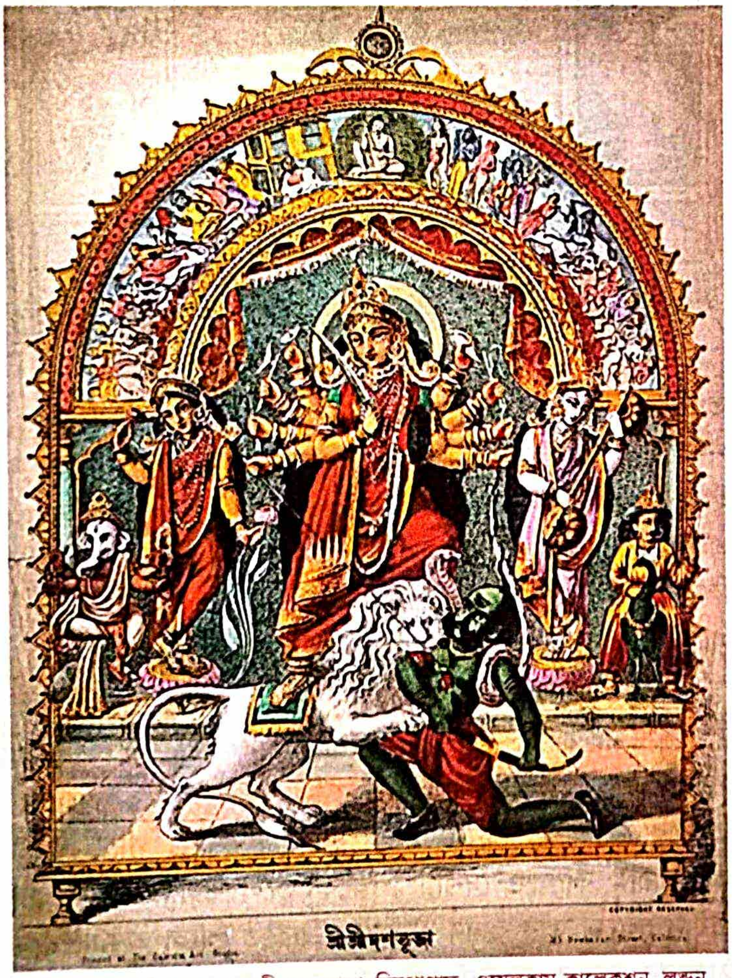

চিত্র ১৫ : দুর্গা, ১৯শ শতাব্দী, কলকাতা, লিথোগ্রাফ, ওয়েলকাম কালেকশন, লন্ডন

চিত্র ১৬ : দুর্গা, ১৮৯৫, কলকাতা, লিথোগ্রাফ, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন

কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইলো—কবে এক হুইস্‌লার এসে তার মধ্য থেকে আনন্দ পাবেন বলে।"[৫] ✍

তথ্যসূত্র

১ দ্রঃ Dalrymple, William: *White Mughals*, Penguin India, New Delhi, 2004, p. 45

২ দ্রঃ *Ibid.*, p. 49

৩ দ্রঃ Fisch, Jorg, 'A Solitary Vindicator of the Hindus: The Life and Writings of General Charles Stuart (1757/58-1828)' in 'Journal of Royal Asiatic Society', no.1, 1985, p. 52

৪ দ্রঃ *Ibid.*, pp. 52-53

৫ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ৯